সীমান্ত পারের নাগরিকত্বহীন সমাজ ঃ প্রসঙ্গ ছিটমহল

দেবব্রত চাকী

ভারত-বাংলাদেশ অমীমাংসিত সীমান্ত সমস্যার অন্যতম ছিটমহল সমস্যা। বাংলাদেশের উত্তরী ভাগের সাবেক রংপুর জেলা বর্তমানে পঞ্চগড়, নিলফামারী, লালমণিরহাট ও কুড়ি-গ্রাম জেলার সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্ত জুড়ে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডজনিত সমস্যা স্বাধীনতাউত্তোর কাল থেকে বিদ্যমান। দেশ বিভাজনের পর যা ছিল ভারত তা আজ পরিবর্তিত পটভূমিতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার সমস্যা হিসাবে বিরাজমান। যদিও এই সমস্যা আরো অনেক পুরানো। বলতে গেলে এই সমস্যা ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্য কোচবিহার ব্রিটিশ শাসিত বাংলার মধ্যেকার বকেয়া একটি সীমান্ত সমস্যা।

ছিটমহলের উৎপত্তি ঃ এখন প্রশ্ন হল এই ছিটমহলগুলির উদ্ভব হল কবে থেকে? এর সহজ উত্তর হল, বর্তমানের বাংলাদেশী ছিট নামক ভারতের কোচবিহার জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত বাংলাদেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম সমূহের উৎপত্তি মোগল শাসিত সুবে বাঙলার আমলে। ১৭৩৬-৩৭ সালে কোচ মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণ ও মোগল বাংলার বা নবাবী বাংলার রংপুরের ফৌজদার কাশেম আলী খাঁর মধ্যে সংঘটিত শেষ কোচ-মোগল সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে এই ছিটখণ্ডগুলির সৃষ্টি। যার বাসিন্দাদের আনুগত্য ছিল তৎকালীন বাংলার নবাবের অনুগত কোচবিহার রাজ্যের সীমান্তবর্তী জমিদারদের প্রতি। কোচ-মোগল সংঘর্ষের সময় এই ভূখণ্ডগুলির বাসিন্দারা কোচবিহার মহারাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। যদিও মোগল ফৌজদারের পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধাবসানের পর কোচবিহারের মহারাজা তাদের ক্ষমার দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন।

অপরদিকে ১৭৭৩ সালে ইঙ্গ-কোচবিহার সন্ধির পর রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত সংলগ্ন কোচবিহার রাজ্যের নাজীর বা সেনাপতির নামে ইজারাকৃত বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ চাকলা নিজ নিয়ন্ত্রণে আনার সময় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মহারাজার জ্ঞাতী-আত্মীস্বজন বসবাসকারী খণ্ড খণ্ড গ্রাম সমূহকে রাজস্ব নির্ধারণ প্রক্রিয়া বা 'হস্তাবুদের আওতার বাইরে রেখে ঐ গ্রামগুলির উপর কিংবা ঐ সকল ভূমি, খণ্ডের উপ-সংযুক্তিগুলির উপর মহারাজার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ কোচবিহার রাজ্যের নাজীরের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রানাধীন গ্রাম সমূহ যার বাসিন্দাদের আনুগত্য ছিল কোচ মহারাজার প্রতি তাদের বসত ভিটা, আবাদিজমি, পুকুর, দেবস্থান-মন্দিরসমূহ, বাঁশ ও ফলের বাগান, রায়তী জমিতে অবস্থিত শাল সেগুন ইত্যাদি গাছের জঙ্গল প্রভৃতি বাস্তু সম্পত্তিকে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃপক্ষ রাজস্ব নির্ধারণ প্রক্রিয়া থেকে ছাড় দিয়েছিল। মূলত কোম্পানীর রংপুরের কালেক্টরর মি. পার্লিং ইঙ্গ-কোচবিহার সন্ধির সূত্র ধরে সমগ্র রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত নির্ধারণের সময় মহারাজার প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন করেন। বৃটিশ বাংলার অভ্যন্তরে থাকা এই গ্রামগুলি কালক্রমে দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের ছিটমহলে পরিণত হয়।

স্বাধীনতার পরে ছিটমহল ঃ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের ভারত ভূক্তি সম্পূর্ণ হলে এই ছিটগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে ভারতীয় ছিটমহলের মর্যাদা লাভ করে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় দেশ বিভাজন হবার ফলেই এই সমস্যার উদ্ভব। সীমান্তে যতদিন মেলামেশা ছিল, অবাধ যাতায়াতের উপর যতদিন কড়াকড়ি ছিল না ততোদিন এই সমস্যা অনুভূত হয়নি। সরকারও বিষয়টির প্রতি সেভাবে নজর দেয়নি। কিন্তু বিগত শতকের পাঁচের দশকে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে। ১৯৫৮ সালের নেহেরু নুন চুক্তি কার্যকর না হওয়ায়, পরবর্তীকালে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশের পর ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজির চুক্তির মধ্যে দিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। যদিও সে সমাধান আজও অধরা। সমস্যার স্বরূপ নিম্নে প্রদর্শিত হল—

দইখাতা আড়াইবিঘা করিডোর

১৯৯২ সালের ২৬শে জুন আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা পালন করতে গিয়ে রাষ্ট্রকে কঠোর প্রশাসনিক বন্দোবস্তে তিনবিঘা করিডোর উন্মোচন করতে হয়েছিল। মূল ভূখণ্ডে যাবার অবাধ অধিকার সেদিন লাভ করেছিল

ভারতের অভ্যন্তরস্থ বাংলাদেশের দুটি বৃহত্তম ছিটমহল **দহগ্রাম ও আঙ্গার পোতাব** মানুষজন। এরপর থেকেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্ত ভারতীয় ছিটমহলগুলির বাসিন্দারা। তৎকালীন কোচবিহার লোকসভা আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ অমর রায় প্রধান এই প্রসঙ্গে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার প্রকাশিত গ্রন্থ **'রুলস অব জঙ্গল'** এর মাধ্যমে। ১৯৯৫ সাল নাগাদ প্রকাশিত এই গ্রন্থে অমরবাবু মানচিত্রের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করেন যে জলপাইগুড়ি জেলার দইখাতা সীমান্ত থেকে একটি করিডোরের মাধ্যমে ভারতীয় ছিটমহল **শালবাড়ি, কাজলদিঘি, বেউলাডাঙা, নটফটকা, দইখাতা** ইত্যাদিকে যুক্ত করতে পারলে প্রায় চল্লিশ হাজার ভারতীয় ছিটবাসী উপকৃত হবেন। মাত্র আড়াই বিঘা জমির প্রয়োজন হবে ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ঐ সমস্ত ছিটমহলকে যুক্ত করতে যা তিনবিঘা করিডোরের মোট জমির পরিমান থেকেও কম। সাংসদ অমর রায় প্রধানের এই প্রয়াসের পর থেকে দইখাতায় আড়াইবিঘা করিডোর ক্রমশ চর্চার মধ্যে উঠে আসে। সংবাদপত্রে তিনবিঘা করিডোরের পাশাপাশি আড়াইবিঘা করিডোর ক্রমশঃ জায়গা পেতে থাকে। বিষয়টির প্রতি রাজনৈতিক দলগুলির দৃষ্টি আকর্ষিত হতে শুরু করার পাশাপাশি তা রাজনৈতিক দাবীর মান্যতা পায়।

আড়াইবিঘা করিডোর ঘিরে আশা ঃ

১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে দলীয় কর্মসূচীতে যোগদিতে তৎকালীন প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় কোচবিহার জেলায় আসেন।

তিনি সেই সময়ে মেখলিগঞ্জ মহকুমার চ্যাংড়াবান্ধায় সভা করার পাশাপাশি তিনবিঘা করিডোর পরিদর্শন করেন। সেই সফরকালে তিনি জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ বেরুবাড়ির দইখাতা সীমান্তে আড়াইবিঘা করিডোর স্থাপনের দাবীতে সোচ্চার হন এবং আন্দোলনে নামার কথা ঘোষণা করেন। বিষয়টি সেই সময়কালে বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ঘোষণায় **শালবাড়ি, দেউতি, নটফটকা, বেউলাডাঙা, কাজলদিঘি, নাজিরগঞ্জ, দইখাতা** ইত্যাদি ছিটমহলের অধিবাসীদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। তারা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন—এবার হয়তো বাংলাদেশের তিনবিঘা করিডোরের মতো অনুরূপ আরেকটি করিডোরের সাহায্যে তারা অবাধে ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করবার অধিকার লাভ করবেন। এর ফলে ঐ সমস্ত ছিটমহলে দীর্ঘকাল ধরে চলা জঙ্গলের রাজত্বের অবসান ঘটবে আইনের শাসন কায়েম হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে প্রাপ্য মৌলিক অধিকার সমূহ তাদের অর্জিত হবে। একদা ব্রিটিশ করদ মিত্র রাজ্য কোচবিহারের মহারাজার অনুগত এই প্রজাবৃন্দ উত্তর স্বাধীনতা পর্বে অর্থাৎ কোচবিহার রাজ্যের ভারতভূক্তির পরে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে যে জীবন যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছেন তার থেকে মুক্তি লাভের আশায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভরসা রাখতে শুরু করেন। বহুদিন পরে তারা নির্ভর করার মতো এক ব্যক্তিকে খুঁজে পান। অথচ নতুন সরকার গঠনের দুবছর অতিক্রান্ত হলেও বিষয়টি আর এগোয়নি। দুর্দশাপ্রাপ্ত ছিটমহলবাসীরা সেই তিমিরেই রইলেন।

বৈষম্য ও অবহেলার শিকার ভারতীয় ছিট ও প্রস্তাবিত করিডোর ঃ

দেখতে দেখতে তিনবিঘা করিডোরের উন্মোচনের ২০ বছর অতিক্রান্ত। করিডোর দিয়ে বাংলাদেশীদের যাতায়াতের সময়সীমা প্রথমে ৬ ঘণ্টা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২ ঘণ্টা এবং সাম্প্রতিক কালে তা ২৪ ঘণ্টায় পর্যবসিত। অর্থাৎ বর্তমান সময়কালে দিবা রাত্র ২৪ ঘণ্টাই তিন বিঘা করিডোর বাংলাদেশীদের জন্য উন্মুক্ত। ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে এবং ভারতীয় ভূখণ্ডের উপর দিয়ে বাংলাদেশীদের নেপাল ও ভূটান যাবার অবাধ সুযোগ।

দহগ্রাম ও আঙ্গারপোতার মতো বৃহৎ আয়তনের (১১ বর্গমাইল) বাংলাদেশী ছিটমহল আজ বাংলাদেশের মূলস্রোতে সামিল অথচ ১৭ বর্গমাইল আয়তনের ঐ সকল ভারতীয় ছিটগুচ্ছের কাছে **আড়াইবিঘা করিডোর** কিংবা কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা-মেখলিগঞ্জ সীমন্তের **বাঁশকাটা ছিটগুচ্ছের** সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে সমর্থ **জোংড়া করিডোর** আজও অধরা। পরন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে ছিটমহল বিনিময় আন্দোলনের নামে চলছে এক অন্য ধরনের সন্ত্রাস। ভারতীয় ভূখণ্ডে বাংলাদেশী পতাকা উড়ানোর জন্য ভারতীয় ছিটমহলবাসীদের ওপর চলছে জুলুমবাজী। এর সাথে চলছে ধর্মীয় সন্ত্রাস, সম্পত্তি বলপূর্বক দখল, নারী নির্যাতন, লুঠ-পাট। বলপূর্বক বাংলাদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে। যাতে ছিটমহল বিনিময়ে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ সমস্ত বিষয়টির পেছনে কাজ করছে এক গভীর ষড়যন্ত্র এবং এর নেপথ্যে রয়েছে সেখানকার একটি রাজনৈতিক দল। যদিও বিষয়টি ভারতীয় প্রশাসনের অজানা নয়। বাংলাদেশী দুষ্কৃতিদের অত্যাচারে বহু প্রকৃত ছিটবাসী ভারতীয় আজ জীবন বাঁচাতে এপাড়ে। বিষয় সম্পত্তি, জমি-জিরেৎ বসতভিটা ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিয়ে তারা আজ ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে উদ্বাস্তুর আখ্যায় আখ্যায়িত। সাম্প্রতিক জনগণনাতেও তারা ব্রাত্য। ছিটমহলগুলিতে অবস্থানরত ভোগদখলকারী বাংলাদেশীরাই নিজেদের ভারতীয় পরিচয় দিয়ে সেই সকল ভূ-খণ্ডের দখল রাখতে এবং ছিট বিনিময় প্রক্রিয়ায় তা নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত করতে উদ্যত। ছিটমহল বিনিময় প্রক্রিয়ার আড়ালে যে প্রহসন চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রতিষ্ঠিত নাগরিক থেকে পলাতক উদ্বাস্তু ঃ

২রা জুলাই ২০১২, কোচবিহার শহরের সাগরদিঘির পশ্চিমপাড়ে জেলা শাসকের দপ্তরে দুপুর বেলায় হাজির হয়েছিলেন একদল মানুষ। হাতে **'ভারতীয় ছিটমহল উদ্বাস্তু সমিতির'** ব্যানার। তারা এসেছিলেন

হলদিবাড়ি, শিলিগুড়ি, লাটাগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি থেকে। এদের সকলের সাবেক ঠিকানা **বালাপাড়া, পাগলাবাড়ি, কাজলাদিঘি, বেউলাডাঙা, বাঁশকাটা, দহলা, খাগড়াবাড়ি, শালবাড়ি, গারলঝোড়া** ইত্যাদি ভারতীয় ছিটমহল। বর্তমানে এরা প্রায় সকলেই কোন না কোন সময় নিজ নিজ ছিটমহলে বাংলাদেশী দুষ্কৃতিদের হাতে লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ১১২ বাঁশকাটা ছিটের বলরাম বর্মণ। ২০১০ সালে বাংলাদেশের বিজয় দিবসে ভারতীয় ছিটমহল ১১২ নং বাঁশকাটায় বাংলাদেশী পতাকা তোলার ফতোয়া অগ্রাহ্য করার মাশুল গুণতে হয়ে তাঁকে। 'ভারত বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি'র তরফে ভারতীয় ছিটে বাংলাদেশী পতাকা তোলার কর্মসূচী পালনে আপত্তি জানায় বলরাম। এরপর নিদারুণ আক্রমণের শিকার হন বলরাম বর্মন। অগত্যা প্রাণ বাঁচাতে ভিটেমাটি ছেড়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মূল ভূ-খণ্ডে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন তিনি। বাঁশকাটা ছিটমহলে ২৫ বিঘা কৃষি জমির মালিক বলরাম এখন শিলিগুড়ি জলারণ্যে একজন দিনমজুর। বলরামের মতোই কাজল দিঘি ছিটমহলের ১৫০ বিঘা জমির মালিক ফলিন রায়, দহলা খাগড়াবাড়ির ২৭ বিঘা জমির মালিক শরৎচন্দ্র রায়, শালবাড়ি ছিটবহলের ৩৬ বিঘা জমির মালিক রফিকুল ইসলাম, ১২০ বাঁশকাটা ছিটের ৩০ বিঘা জমির মালিক অসিত বর্মণ; বেউলাডাঙা ছিটের ২০ বিঘা জমির মালিক বিশুরাম রায়, ২১ বিঘা জমির মালিক প্রফুল্ল কুমার রায়, বালাপাড়া খাগড়াবাড়ির ৬০ বিঘা জমির মালিক শ্যামলেশ বায় প্রধান; কাজলাদিঘি ছিটেরই ২২ বিঘা জমির মালিক বীরেন রায়, ১৫ বিঘা জমির মালিক আব্দুল হামিদ, ২৩ বিঘা জমির মালিক আনারুল হক; ১১৯ বাঁশকাটা ছিটের ২২ বিঘা জমির মালিক যোগেন্দ্রনাথ রায় কিংবা দহলা খাগড়াবাড়ির ২২ বিঘা জমির মালিক সুবোধ বর্মণ হয়তো বা দিনমজুর, চায়ের দোকানদার, সব্জি বিক্রেতা কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হয়ে মূল ভূ-খণ্ডে উদ্বাস্তুর জীবনযাপন করছেন। এদের অনেকেরই না আছে রেশন কার্ড, না আছে গণতন্ত্রের সব থেকে বড় পরিচয় ভোটাধিকার। বেঁচে থাকায় এই সমস্ত যন্ত্রণার কথাই তাঁরা বলতে এসেছিলেন জেলা শাসককে। কিন্তু জেলা শাসক বাইরে থাকায় অতিরিক্ত জেলা শাসকের শরণাপন্ন হন তাঁরা। কিন্তু অতিরিক্ত জেলা শাসক তাঁদেরকে নামমাত্র সাক্ষাতের সুযোগ দিয়ে তাদের বক্তব্য জেলা শাসককেই জানানোর মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। অগত্যা এই সকল হতভাগ্য মানুষেরা বিফল মনোরথে বিকাল বেলা যে যার আস্তানায় ফিরে যান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ২০১০ সালের ২৭শে অক্টোবর বাংলাদেশের লালমণিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপ জেলার অভ্যন্তরস্থ ভারতীয় ছিটমহলের বাসিন্দারা 'ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল' নামক সংগঠনের ব্যানারে ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে মিছিল করে এসেছিলেন মাথাভাঙা মহকুমার নলঙ্গীবাড়ি সীমান্তে। কিন্তু সীমান্ত রক্ষী বাহিনী তাদেরকে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশে অনুমতি দেয়নি। ভারতীয় প্রশাসনের উদ্দেশ্যে লেখা স্মারকলিপি বি এস এফ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েই তাদের ঘরে ফিরতে হয়। এরপরই ছিটবাসী ভারতীয়দের সংগঠন 'ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল'কে ভাঙতে উঠে পড়ে লাগে 'ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি'। বলরাম বর্মন সেই আক্রোশেরই শিকার হন। ছিটবাসী ভারতীয়দের (পড়ুন দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের আদি বাসিন্দাদের) ঐক্য বিনষ্ট করতে আজও বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী শক্তি সক্রিয়। সে দেশের রাজনৈতিক দলগুলির একাংশের মদত এদের পেছনে সর্বদাই শক্তি যোগাচ্ছে। অথচ এ পাড়ের রাজনৈতিক মহল বিষয়টি সম্পর্কে প্রায়ই নিঃস্পৃহ।

ছিট নিয়ে নোঙরা রাজনীতি

কোচবিহার শহরে মাঝে মধ্যে মিছিল মিটিং সংগঠিত করতে দেখা যায় একদল ছিট মহলবাসীকে, যারা মূলতঃ দিনহাটা মহকুমার দক্ষিণ সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশী ছিট সমূহের বাসিন্দা। ভারতের অভ্যন্তরস্থ এই সকল বাংলাদেশী ছিটের বাসিন্দাদের মূল দাবী ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার ছিটগুলির বিনিময় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান এবং ভারতের মূল স্রোতে সামিল হওয়া নিশ্চিত করা। এদেরকে সংগঠিত করে দুটি সংগঠন এই মুহূর্তে আন্দোলন চালাচ্ছে। একটি **'ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি'** এবং অপরটি **'ছিটমহল বিনিময় সংগ্রাম কমিটি'**। প্রথম সংগঠনটি তৈরী করেন ফরওয়ার্ড ব্লক দলের প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত দীপক সেনগুপ্ত এবং দ্বিতীয় সংগঠনটির স্রষ্টা প্রাক্তন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হরিপদ মণ্ডল। বর্তমানে প্রয়াত দীপক সেনগুপ্তের পুত্র দিপ্তীমান সেনগুপ্তের নেতৃত্বে 'ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি'র কার্যকলাপ জারী রয়েছে। এদের দিনহাটা কেন্দ্রীক সংগঠনটি ভারতীয় শাখা এবং এই সংগঠনের বাংলাদেশ শাখা সেখানকার রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি'র সমর্থন পুষ্টি বলে পরিচিত। বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুশেইন মহম্মদ এরসাদ ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির একজন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। এই সংগঠনের অন্যতম কর্মসূচী বাংলাদেশী ছিটে ভারতীয় পতাকা এবং অপর দিকে ভারতীয় ছিটে বাংলাদেশী পতাকা যথাক্রমে ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসে ও ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবসে উত্তোলন করা। এই কর্মসূচী পালন নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। ছিট বিনিময় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার আগেই ভারতীয় ভূখণ্ডে বাংলাদেশী পতাকা উত্তোলনের আহ্বান নিঃসন্দেহে অভিসন্ধিমূলক ও দেশবিরোধী কার্য হিসাবে ইতিমধ্যেই সমালোচিত হতে শুরু করেছে। অনেকেই এর মধ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি খুঁজতে শুরু করেছেন। কারণ এই সংগঠন বাংলাদেশীদের ভারতীয় নাগরিকত্বলাভ এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্ত ভারতীয় ছিটবাসীদের বাংলাদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণ করাতে অতিমাত্রায় আগ্রহী। ভারতীয় ছিটবাসীদের তরফ থেকে এমন অভিযোগ উঠছে

যে, এই সংগঠনের সদস্যরা রীতিমতো ভীতি প্রদর্শন করে ভারতীয় ছিটবাসীদের বাংলাদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণে সম্মতি জানাতে বাধ্য করছে। যা রীতিমতো ভারত ও ভারতীয়ত্ব বিরোধী কার্যের সমতুল। বলপূর্বক নাগরিকত্ব গ্রহণের অনুকুল বাতাবরণ তৈরির লক্ষ্যে থাকে ভোট ব্যাঙ্ক বৃদ্ধি করা। 'বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি' হয়তো বা তাদের ভোট ব্যাঙ্ক বৃদ্ধির উপাদান হিসাবে অসহায়, অসম যুদ্ধে দীর্ণ ভারতীয় ছিটবাসীদের টার্গেট করেছেন। এক্ষেত্রে তারা সঙ্গী হিসাবে ভারতের অভ্যন্তরে কিছু কেষ্টবিষ্টুর সহায়তা পাচ্ছেন। যারা ছিটবাসী ভারতীয়দের (পড়ুন সাবেক দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের মহারাজার প্রজাবৃন্দ) অপেক্ষা বাংলাদেশী ছিটবাসীদের নিয়েই অতি মাত্রায় ব্যস্ত। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন, আর্থ সামাজিক কারণে বাংলাদেশীদের ভারতমুখী অনুপ্রবেশের হার উর্দ্ধমুখী। বিশেষ করে সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (পড়ুন অমুসলমান জনগোষ্ঠী)-এর সিংহভাগ ইতিমধ্যেই 'নিরুদ্দেশ' শিরোপায় ভূষিত। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায় তারা দেশান্তরী এবং অবশ্যই গন্তব্য ভারত। এটাই যে দেশের সামাজিক চিত্র, সেখানে বাংলাদেশ ভূখণ্ড পরিবেষ্টিত ভারতীয় ছিটবাসী মানুষজন ছিটবিনিময় প্রক্রিয়ায় ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণের ও ভারতভূমিতে পুনর্বাসনের সুযোগ অগ্রাহ্য করে বাংলাদেশী নাগরিকত্ব লাভের প্রত্যাশায় সেদেশে ছিট বিনিময় আন্দোলনের সামিল হবে — তা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে ভারতীয় ছিটবাসীদের এক বড় অংশকে বলপূর্বক উৎখাত করে সেই ছিটগুলি এখন বাংলাদেশী দুষ্কৃতিদের দখলে। তারাই ছিটমহল বিনিময় আন্দোলনের নামে দখলকৃত ভূ-সম্পত্তির অধিকার পাকাপাকি লাভে সক্রিয়। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে অমীমাংসিত সীমান্ত সমস্যার সুযোগ নিয়ে ছিটমহলগুলিতে চলছে এক অরাজকতা। স্বভাবতই ছিটমহল বিনিময় ইস্যুতে ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির আন্দোলনকে ইতিমধ্যেই সন্দেহের চোখ দেখতে শুরু করেছে ভারতের মূলস্রোতের রাজনৈতিকদলগুলি। অন্যদিকে হরিপদ মণ্ডলের নেতৃত্বাধীন 'ছিটমহল বিনিময় সংগ্রাম কমিটি'র কার্যকলাপ কনভেনশন্ ডেপুটেশন ইত্যাদি মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। আর ভারতীয় ছিটমহলবাসীরা মূলত অসংগঠিত গরীব তফশীলী রাজবংশী ও অন্যান্য দলিত ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ, তাই দুই দেশেই নেই তাদের কোন লবি। তারা কেবলি অবহেলা ও অত্যাচারের শিকার।

সমাধান কবে হবে?

এখন প্রশ্ন হল ছিটমহল সমস্যা নামক ভারত-বাংলাদেশের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই সমস্যা বা ছিটগুলির ও ছিটবাসীদের এই অরাজক অবস্থা আর কতদিন চলতে পারে? একবিংশ শতাব্দিতে নাগরিকত্বহীনতার যন্ত্রণা প্রকৃত অর্থে সভ্যতার লজ্জা। প্রতি মুহূর্তে তারা প্রত্যাশা করেন অচিরেই তাদের যন্ত্রণার অবসান ঘটবে। যারা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটে শত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে এখনো মাটি আকড়ে পড়ে রয়েছেন তারা প্রত্যাশা করেন এবার হয়তো বা মূল ভারত ভূ-খণ্ডে যাবার অবাধ প্রবেশ পত্র কিংবা তিনবিঘার মতো করিডোর তারা লাভ করবেন। যারা বাংলাদেশী দুষ্কৃতিদের দ্বারা উৎখাত হয়ে মূল ভূখণ্ডে পালিয়ে এসেছেন তারা সবসময় প্রত্যাশা করেন ভারত সরকার তাদের নাগরিকত্ব প্রদানের পাশাপাশি সমস্ত রকম নাগরিক সুবিধা প্রদান ও ফেলে আসা ভূ-সম্পত্তি দখলমুক্ত করে সেখানে পূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েমে সচেষ্ট হবেন। ভারতীয় ছিটবাসীদের এক বড় অংশ ছিট বিনিময় অপেক্ষা করিডোর অথবা অবাধ যাতায়াতের অনুমতি পত্রে অতি মাত্রায় আগ্রহী। তবে এ কথা ঠিক তিনবিঘার মতো যত্রতত্র করিডোর সম্ভব নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে করিডোর সম্ভব যেমন জোংড়া, আড়াইবিঘা কিংবা ঐ ধরনের প্যাসেজ যেখানে সম্ভব সেগুলি ব্যাতিরেকে অবশিষ্ট ছিটমহলের বিনিময় সম্পর্কিত বিষয়টি নতুনভাবে ভাবা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালের ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির পটভূমি এখন নেই। অনেক পরিবর্তন এসেছে সে দেশে। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে রচিত ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধান এখন আর নেই। ২০১১ সালের ৩০ শে জুন বাংলাদেশে পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব সংসদে অনুমোদন লাভের পর সংবিধানের সূচনায় 'বিসামল্লাহির রাহমানির রহিম', রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলামের স্বীকৃতি ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সুযোগ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত সংযোজিত হয়েছে। স্বভাবতই এই ঘটনায় সে দেশের সংখ্যালঘুরা ইতিমধ্যে শঙ্কিত। বাংলাদেশ 'আদিবাসী ফোরাম' এই সংশোধনীর বিরোধীতা করেছে। তাদের উদ্বেগের জায়গাটি কোথায় তা বোঝা কঠিন নয়। ছিটবাসী ভারতীয়রাও আজ একইভাবে শঙ্কিত। তাই ছিটমহল সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশের পরিবর্তিত পটভূমি বিচার্য হওয়া জরুরী।

সমাধান কিভাবে?

কিন্তু এত কিছুর পরেও একটি প্রশ্নের অনিবার্যতা প্রায়শই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে পূর্বের চুক্তি ধরে ছিটমহল বিনিময় প্রক্রিয়া সম্বন্ধে। যেটা হল ছিটমহল বিনিময় মানে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার ১৭১৫৮.১৩ একর ভূ-খণ্ড বাংলাদেশকে হস্তান্তর। বিনিময়ে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহলের ৭১১০.০২ একর ভূ-খণ্ড প্রাপ্তি। বাংলাদেশের যে ভূ-খণ্ডগুলি ভারতের কোচবিহার জেলার অভ্যন্তরে রয়েছে সেগুলি সাবেক অবিভক্ত বাংলার রংপুর জেলার অংশ। অপরদিকে ভারতের বিনিময়যোগ্য যে ১১১টি ছিটের উল্লেখ করা হয়ে থাকে তা একদা দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের ভূ-সম্পত্তি। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা প্রাপ্তির বেশ কিছুদিন পর তা ভারতের সঙ্গে সংযোজিত হয়। বিষয়টি পরবর্তীতে আলোচ্য। যাই হোক ছিটমহল বিনিময় হওয়ার অর্থ ভারতকে ১০০৪৮.১১ একর পরিমাণ ভূ-খণ্ডের ক্ষতি স্বীকার। বিষয়টিকে আইনগত ভাবে মান্যতা দেওয়া, যা সংবিধান সংশোধন ব্যতিরেকে কখনোই সম্ভব নয়। কারণ ১৯৭৪ সালের স্থলসীমা চুক্তি অনুযায়ী ভারতের পক্ষ থেকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, ছিটমহল

বিনিময় প্রক্রিয়ায় ভারতকে যে জমি হারাতে হবে তার জন্য কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না (1.12 The Indian enclaves in Bangladesh and the Bangladesh enclaves in India should be exchanged expeditiously, excepting the enclaves mentioned in paragraph 14 without claim to compensation for the additional area going to Bangladesh)। অর্থাৎ ছিটমহল বিনিময় কার্যকর হলে ভারতকে ১০ হাজার একর পরিমাণ জমি ক্ষতি স্বীকার করেই তা করতে হবে। যদিও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে এই সকল ভূখণ্ড ব্রিটিশ শাসিত ভারতের ছিল না, ছিল একটি দেশীয় রাজ্যের; যার নাম কোচবিহার।

জমির জটে ছিট বিনিময়

এখন প্রশ্ন হল, ছিটমহল বিনিময় প্রক্রিয়ায় ভারত যে সকল ভূখণ্ড বাংলাদেশকে হস্তান্তর করবে তা ভারতীয় প্রশাসনেরএক্তিয়ারে আসলো কোন প্রক্রিয়ায় তা কি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ একবারও খতিয়ে দেখেছেন? যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এই সকল ভূমি খণ্ড ভারতীয় ভূখণ্ড হিসাবে পরিচিতি লাভ করল তার ইতিহাস ব্যতিরেকে এই সমস্যার সমাধান করা কি যায়? এই বিষয়টি আগে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ভেবে দেখতে হবে। ভুল একবার হলে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি বারংবার ঘটবে, তা কিন্তু কাঙ্খিত নয়। প্রথমেই আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন ভারতীয় ছিটমহল হিসাবে যে ভূখণ্ডগুলির উল্লেখ মানচিত্রে পরিলক্ষিত হয় সেগুলি আদতে ছিল দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের ভূখণ্ড। আজ থেকে ৬৫ বছর আগে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট যখন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ভারত আত্মপ্রকাশ করে তখনও এই সকল ভূখণ্ড সমূহের উপর ভারত সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব আসেনি। এই এলাকাগুলিতে তখনও ছিল কোচবিহারের মহারাজার শাসন। সেই সময় কোচবিহারের শাসক ছিলেন মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর। দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিতে (পড়ুন ধর্মের ভিত্তিতে) দেশ বিভাজনের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে রাষ্ট্র যথাক্রমে ১৪ ও ১৫ই আগষ্ট আত্মপ্রকাশের প্রাক্‌মুহূর্তে কোচবিহারের মহারাজার সঙ্গে তৎকালীন ভারতের তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক সমঝোতায় উপনীত হন। সেই সমঝোতার মধ্যে দিয়ে দেশীয় রাজ্য কোচবিহার ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্‌মুহূর্তে ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনভার মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণে হাতেই ন্যস্ত থাকে। এই সমঝোতার প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'ইনস্ট্রুমেন্ট অফ্ অ্যাকশেসন (Instrument of Accession)'।

১৯৪৭ সালের ৯ই অগাস্ট তারিখে কোচবিহারের মহারাজা ও ভারতের গভর্নর জেনারেলের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই সমঝোতা পত্রের সম্পূরক অংশ হিসাবে ১৪ই আগস্ট '৪৭ আরেকটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন কোচবিহারের মহারাজার হয়ে তৎকালীন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিম্মৎসিং কে. মাহেশ্বরী এবং ভারত সরকারের সচিব ভি. পি. মেনন। এই চুক্তিকে Stand Still Agreement বা স্থিতাবস্থা চুক্তি নামে অভিহিত করা হয়। এই চুক্তির 1(i) ধারায় উল্লিখিত হয় যে, 'Until new agreement in this behalf are made, all agreements and administrative arrangements as to matters of common concern now existing between the Crown and any Indian State shall, in so far as may be appropriate, continue as between the Dominion of India or, as the case may be, the part there of, and the State'। এই চুক্তির ফলশ্রুতিতে কোচবিহার রাজ্যে ভুটানী আগ্রাসনের পূর্ব পর্যন্ত যে রাজ্যের আয়তন ছিল ৩২০০ বর্গমাইলের অধিক যা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের কূটকৌশলে কমতে কমতে ১৩১৭ বর্গমাইলে অবশিষ্ট ছিল, তার উপর চূড়ান্ত মোহরোঙ্কিত হয়ে যায়। ১৭৭৩ সালের কোচ-ইংরেজ সন্ধি ও ১৭৭৪ সালের ইঙ্গ-ভুটান চুক্তির সূত্র ধরে কোচবিহার মহারাজার বিস্তীর্ণ এলাকা ইংরেজ শাসকবর্গ গ্রাস করার সুবাদে সৃষ্ট কোচবিহার রাজ্যের ছিটসমূহ, যা ব্রিটিশ শাসিত বাংলার অভ্যন্তরে থেকে যায়, তা কোচবিহার মহারাজা শাসিত ১৩১৭ বর্গমাইল আয়তনের এলাকার মধ্যেই অবস্থান করতে থাকে। 'স্ট্যান্ড স্টিল' চুক্তির মধ্যে দিয়ে যেমন কোচবিহার রাজ্যের হাতছাড়া প্রায় ১৮৮৩ বর্গমাইল এলাকা ফেরৎ পাবার সম্ভাবনা চিরতরে লোপ পেয়ে যায়। সেরকম কোচবিহার রাজ্যের ছিটমহলসমূহ, যেগুলির অবস্থান ছিল সদ্য আত্মপ্রকাশকারী পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে, সেগুলির ওপর কোচবিহার মহারাজার সার্বভৌমত্ব বা বলা ভাল ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকশেসনের সূত্র ধরে ভারতের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়ে পড়ে। এর পরবর্তীতে ১৯৪৯ সালের ২৮ শে আগষ্ট কোচবিহার মহারাজা ও ভারত সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির মধ্যে দিয়ে ঐ বছরের ১২ই সেপ্টেম্বর কোচবিহার রাজ্যের (পড়ুন ১৩১৭ বর্গমাইল এলাকা সমন্বিত) চূড়ান্ত ভারত ভুক্তি সম্পন্ন হয়। রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তোরণের পর কোচবিহার, তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙা, মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি থানা সমন্বিত কোচবিহার প্রথম ৩ মাস ১৯ দিন চিফ কমিশনার শাসিত রাজ্য হিসাবে থাকার পর ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসাবে পরিচয় বহন করে আসছে।

উপসংহারের পরিবর্তে ঃ

এখন বর্তমান নিবন্ধের আলোচনার সূত্র ধরে যে প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক তা হল, বিভিন্ন সময়কালে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে কোচবিহার রাজ্যের তদানিন্তন হৃত অংশ কোচবিহারকে ফেরত দেবার দাবি উঠলেও তা সরকারের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সহজ হয়ে ওঠে উপরোল্লিখিত 'স্থিতাবস্থা চুক্তির' সূত্র ধরে। একই ভাবে সাবেক কোচবিহার রাজ্যের অংশ (পড়ুন ছিটমহলসমূহ) অন্য রাষ্ট্রকে হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে Stand still Agreement অন্তরায় হবে না তো! বিষয়টি একেবারেই আইনগত ও সাংবিধানিক। আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের উচিত এ বিষয়ে যথাযথ দিক নির্দেশ করা। মনে রাখা উচিত ভারতীয় ছিটমহল সমূহ ব্রিটিশ ভারত কশাসিত এলাকা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভারতীয় ভূখণ্ড

নয়, এই এলাকা সমূহ নিতান্তই একটি দেশীয় রাজ্যের। বিভিন্ন চুক্তিপত্রের মধ্যে দিয়ে তা ভারতীয় এলাকায় পর্যবসিত। ফলে বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল। অতএব অত্যন্ত সংবেদনশীলতা ও বিচক্ষণতার সাথে সূক্ষ্ম বিচার করে দুই দেশের মধ্যে দ্রুত ও স্থায়ী বোঝাপড়া ও চুক্তি এবং তার অবিলম্বে প্রয়োগে ছিটবাসীদের চিরন্তন সমস্যাগুলিকে চিরস্থায়ীভাবে সমাধান করতে হবে।

চা-বাগান শ্রমিকদের সমানাধিকারের উত্তরণে দার্জিলিং চা

সুমন রাই

স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় দার্জিলিং চা এর কথা বিশ্বের কে-না জানে? এখানকার জলবায়ু ও চা উৎপাদনের বিশেষ প্রণালীই দার্জিলিং চাকে এই অনন্য বিশিষ্টতা দিয়েছে। অবশ্যই এরই সঙ্গে হাত ধারধরি করে আছে দার্জিলিং চা এরই কিছু সমস্যা যা আবার আজকের নয়; বহুদিন ধরেই এই সঙ্কট গড়ে উঠেছে। দার্জিলিং চা-এর এক বড় বাজার ছিল ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৯০ এ তার ভাঙনের পর যে বাজার মার খেয়েছে। তার ওপর বর্তমানে জৈব সার বা জৈব প্রযুক্তি যেভাবে বাধ্যতামূলক হচ্ছে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে রাসায়নিকনির্ভর চা শিল্প তার সঙ্গে তাল রাখতে না পারায় সঙ্কট তৈরী হচ্ছে সেখানেও।

কিনিয়া ও শ্রীলঙ্কার মত দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও এক অদ্বিতীয় ভোগ্য পণ্য হিসেবে দার্জিলিং চায়ের সংরক্ষণের প্রশ্ন যুগপৎ একে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

দার্জিলিং চা যখন বাজার সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে সফলতার সঙ্গে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়ে উঠছে, তখন একই সঙ্গে একে এখানকার অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও চা বাগানগুলি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বহু বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীনও হতে হয়েছে। চা-শ্রমিক ও পরিচালকবর্গের মধ্যে হিংসার ঘটনাগুলি অত্যন্ত কুৎসিত রূপ নিতে দেখা গেছে যা চা-বাগানগুলিকে কলুষিত করে তুলেছে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, বিভিন্ন বাগিচা শিল্পগুলির মতোই দার্জিলিংয়ের চা বাগানগুলিও দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। দার্জিলিং চা-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ৫০,০০০ এরও বেশি শ্রমিক সম্বলিত এখানকার গ্রামীণ অঞ্চলগুলি রাজনৈতিক দলগুলির কাছে একটি হৃষ্টপুষ্ট ভোটব্যাংক ছাড়াও রাস্তায় নেমে তাঁদের বক্তব্যগুলি প্রচারের জন্য মোতায়েন করার পক্ষেও সংখ্যাটি বেশ ভাল। শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের এক দীর্ঘ ইতিহাস ও বহু বছর ধরে নৈরাশ্যের সাধারণ অনুভূতিই চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে রাজনীতির প্রবেশ পথকে সুগম করে তুলছে।

বছরের পর বছর চা-বাগান শ্রমিকদের কল্যাণমূলক কাজের জন্য বরাদ্দ কমতে কমতে তলানিতে এসে ঠেকেছে। কাজের মজুরী ছাড়াও শ্রমিক কল্যাণে বরাদ্দ আনুষঙ্গিক প্রাপ্তিযোগ তাঁদের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এই প্রাপ্তিগুলি বাদ দিলে বর্তমানে তাঁরা যে মজুরী পায় তা দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থানকারী মানুষদের জন্য বিশ্বব্যাংকের নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরীর (দুই ডলার প্রতিদিনের) তুলনায় অনেকটাই কম। বাগিচা শ্রমিক আইন ১৯৫১ অনুযায়ী আনুষঙ্গিক প্রাপ্তি যেমন পরিবারের জন্য শৌচাগার, কম্বল, হাঁটু অবধি বুট জুতো, শিশুদের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি বাগান অনুযায়ী, বাগানের মালিক অনুযায়ী আলাদা। আর কিছু কিছু বাগানের ক্ষেত্রে এগুলির প্রায় নেই বললেই চলে। সবচেয়ে খারাপের দিক হল শ্রমিকরা তাদের অধিকারগুলা সম্বন্ধে এত বেশী উদাসীন যে তাদের না আছে কথা বলার ক্ষমতা না কার্যকরী কিছু করার ক্ষমতা। ফলে যা হবার তাই হয়েছে— হয়েছে যা হবার নয় তাই। ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রমিকদের বাঁচানো বা শেখানো তো দূরের কথা, বহুক্ষেত্রে সরাসরি মালিকপক্ষের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে শ্রমিকদের প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে যাবতীয় শোষণ ও আক্রমণের মুখে। পরিণামে সহায়সম্বলহীন আশাহীন ছন্নছাড়া এক শ্রমজীবী বাহিনীর সারি ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

চা-শ্রমিকদের মজুরীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছিল ২০১১ সালে যখন এক লাফে তা ৯০ টাকায় পৌঁছে গিয়েছিল ৬৭ টাকা থেকে বেড়ে, যে ৬৭ টাকায় পৌঁছাতে শুরুর সেই ১৪ টাকার ১৪ বছর সময় লেগে গিয়েছিল। এইবার চা কোম্পানীগুলিকে নতিস্বীকার করতেই হয়েছিল